মুসলিম পারিবারিক আইনে নারীর স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা প্রসঙ্গ দেন-মাহর ও নারী জীবনের বাস্তবতা

মোঃ আবু সায়েম*

সার-সংক্ষেপ

ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিধি বিধানকে অলংঘনীয় রেখে সময়ের চাহিদানুযায়ী সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জীবনে জড়িত বিভিন্ন ধর্মীয় নিয়ম-কানুনকে (শরীয়া) সহজ ও প্রাণবন্ত করার জন্য ইসলামে রয়েছে যুগোপযোগী গবেষণার (ইজতেহাদ) সুযোগ। এরকম গবেষণামূলক জ্ঞানচর্চার কারণে মুসলিম দেশের শাসকগণ ইসলামি পণ্ডিতগণের (উলামা) সাথে পরামর্শ ও পর্যালোচনা করে নিজ দেশের মুসলিম নাগরিকদের সুবিধার্থে আধুনিক ও ইসলামি আইন-কানুন সমন্বয় সাধন করে প্রচলিত বা ঐতিহ্যবাহী বিধি বিধানকে সময়োপযোগী ও বাস্তবসম্মত করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, যা অনেক মুসলিম দেশে মুসলিম আইন নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের দেশে ধর্মপ্রাণ সাধারণ মুসলমানদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি লক্ষ রেখে বিদ্যমান রয়েছে মুসলিম পারিবারিক আইন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে উক্ত আইনগুলোতে মুসলিম নারীর স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা বিশেষত বিবাহের সময় দেন-মাহরের প্রাপ্যতা বা বৈবাহিক জীবনে এর বাস্তবতা কতটুকু নিশ্চিত করা হয়েছে তা নিয়ে আমাদের সামাজিক জীবনের বাস্তবতার নিরিখে একটি যুক্তিসংগত আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। পরিশেষে নারীর স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলোকে আরও সুসংহত ও নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যমান আইনগুলোর কতিপয় ক্ষেত্রে বেশ কিছু আইনি পদক্ষেপ সংযোজন ও তা যথাযথভাবে প্রয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

Abstract

In Islam there is a scope of research (Ijtihad) to Update existing laws (Shariah) related to Muslim life, if the basics of Islam are not violat it. Because of the opportunity, Muslims can bring prevailed religious laws up to date by combining with modern laws. These laws are generally known as Islamic laws or Muslim laws. With this same line, in our country there are still now some religious laws with duly maintaining the people's sentiment to religion. However, one of these laws is known as Muslim family Law. The present article deals with a critical analysis in the light of our present social context as to how much privileges for muslim women specially for their right of dowry (Mahr) during marriage time or its implementation at married life are ensured so far within the prevailed law. Finally the article also places some recommendations for few crucial supplementary to the law concerned and for proper implementation of it in order to ensure women's right.

* সহযোগী অধ্যাপক, বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধানকে অলঙ্ঘনীয় রেখে পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে জনস্বার্থে শরী'আ আইনকে সংস্কার করার মাধ্যমে যুগ-উপযোগী করাই দীন ইসলামের একটি বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর প্রথম মানব ও প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ) হতে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত সকল নবীই একই ইসলামের প্রচার প্রসার কাজে রত থাকা সত্ত্বেও তারা প্রত্যেকেই স্থান ও সময়ের ভিন্নতার কারণে শরী'আ বা আইন-কানুনের ক্ষেত্রে এক জন আরেক জন থেকে ভিন্নতর ছিলেন। নবী রাসুলগণেরই দায়িত্ব ছিল মানব জীবনের বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতিতে সৃষ্ট বহুমুখী সমস্যার ইসলামি সমাধান পেশ করে তাদের স্ব স্ব শরী'আতকে আরও বেশি গতিশীল করা। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পরে দীনের মুজাদ্দিদগণ[১] উক্ত মহান দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন এবং যুগ-সমস্যার আলোকে নতুন করে ইসলামি ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তাদেরই গবেষণালব্ধ জ্ঞানভাণ্ডারের সূত্র ধরে মুসলিম দেশের শাসকগণ ইসলামি পণ্ডিত ও চিন্তাবিদগণের সাথে পরামর্শ-পর্যালোচনা করে দেশের মুসলিম নাগরিকদের সুবিধার জন্য আধুনিক আইন ও ইসলামি আইনকে সমন্বয় করে নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করেছেন, যা সাধারণত মুসলিম আইন নামে পরিচিত। এভাবে আধুনিক বিশ্বে বিভিন্ন দেশে মুসলিম আইনের বিবর্তন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে বাংলাদেশে বিবাহ, মাহ্‌র, যৌতুক, তালাক প্রভৃতি ক্ষেত্রে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন, ১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইন, ২০০২ সালের এসিড দমন আইন, ২০০৩ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০৫ সালের বিবাহ-বিচ্ছেদ নিবন্ধন সংশোধন আইন প্রভৃতি প্রণয়নের ফলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের ন্যায় নব ইজতিহাদ মূলে বড় ধরনের সংস্কারমূলক অগ্রগতি না হলেও এ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত হানাফী আইনের ব্যত্যয় ঘটেছে সন্দেহ নেই। মুসলিম পারিবারিক আইনে যদিও নারীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে নিশ্চিত করা হয়েছিল, তথাপিও আইনের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে ও কিছুটা অস্পষ্টতার কারণে কিংবা আইনটি যেভাবে প্রয়োগ হওয়া দরকার, সেভাবে প্রয়োগ না হওয়ায় নারীরা এখনও তাদের অধিকার সম্পূর্ণরূপে পাচ্ছে না কিংবা দেয়া হচ্ছে না।

পাকিস্তান আমলে ১৯৫৫ সনে ব্রিটিশদের প্রণীত মুসলিম আইন সংস্কারের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিশন মুসলিম আইনের কিছু কিছু সংস্কার-সংশোধনী সুপারিশ করে। এর ফলে পরবর্তীতে ১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইন তৈরি হয়। যদিও এ আইন প্রণয়নের পর অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন তদানীন্তন সরকার, তবুও বলা যায় যে, সার্বিক বিচারে এ আইনের বাস্তবায়ন ইসলামি শরীয়ার বিপক্ষে না গিয়ে বরং পক্ষেই গিয়েছে। উত্তরাধিকার সম্পর্কিত প্রচলিত হানাফী আইনের পরিবর্তন করে এ অধ্যাদেশে বিধান করা হয় যে, যার সম্পত্তি ভাগ-বণ্টন করা হবে তার মৃত্যুর পূর্বে তার কোন পুত্র বা কন্যা মারা গেলে এবং উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সম্পত্তি ভাগ বন্টনের সময় পূর্বে মৃত সন্তানের পুত্র বা সন্তানাদি জীবিত থাকলে তারা প্রতিনিধিত্বের হারে সম্পত্তির ঐ ভাগই পাবে, যা তাদের পিতা বা মাতা জীবিত থাকলে পেতেন (ধারা-৪)। এ আইনটি প্রণয়ন-পূর্বাবস্থায় দেখা যেত যে দাদার পূর্বে পিতার মৃত্যুর কারণে নাতি-নাতনিরা ও বিধবা স্ত্রী দাদার কিংবা শ্বশুরের সম্পত্তি থেকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অজুহাতে বঞ্চিত হত। যদিও এমতাবস্থায় এতিম নাতি-নাতনিদের ও তাদের বিধবা মায়েদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দাদাকে বা শশুরকে প্রয়োজনীয় পরিমাণের সম্পদ অসিয়ত করে তাদের প্রাপ্য অধিকারের চেয়ে অতিরিক্ত আরও কিছু বেশি প্রদানে উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত অসিয়ত করার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না হওয়ায় এতিম নাতি-নাতনিরা ও তাদের বিধবা মায়েরা প্রায়ই বঞ্চিত হত তাদের অধিকার থেকে। তাই এহেন দুরবস্থা থেকে রক্ষা পেতে আইনের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বের বিধান করা হয়েছে – যা শরীয়া আইনের লঙ্ঘন না হয়ে বরং ব্যাখ্যাই হয়েছে। আসলে ইসলামের কোথাও প্রতিনিধিত্বের ধারণাকে অস্বীকার করা হয়নি। যেমন- মানুষ নিজেরই আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করেছে পৃথিবীতে[২], আর দ্বীনীজ্ঞানে পণ্ডিত ব্যক্তিরা হলেন, নবী-রাসুলদের প্রতিনিধি।[৩] যেহেতু সব জায়গাতেই প্রতিনিধিত্বের বিধান কার্যকর; সেহেতু দাদা বা শশুরের সম্পত্তিতে পিতা বা স্বামীর প্রতিনিধি হিসেবে নাতি-নাতনি ও বিধবা স্ত্রী অবশ্যই অংশ পাবে। আর এখানে

অসিয়ত করার অর্থ এই যে, প্রতিনিধিত্বের হারে তাদের অংশতো ঠিকই থাকবে; বরং এক জনের অনুপস্থিতিতে তাদের যে বিরাট ক্ষতি হয়েছে – দাদাকে অসিয়ত করার মাধ্যমে তা কিছুটা পুষিয়ে দিতে বলা হয়েছে, যা অন্যদের চেয়ে অতিরিক্ত আরও কিছু বেশি নির্দেশ করে।

১৯৬১ সনের এ আইনে বিবাহ সম্পর্কিত বিষয়ে ইতিপূর্বে প্রচলিত সমুদয় প্রথা ও রীতি-নীতি বাতিল করে তদস্থলে সকল বিবাহ অবশ্য রেজিস্ট্রিতব্য বলে বিঘোষিত হয় (ধারা-৫)।

আইনটিতে সকল বিবাহ রেজিস্ট্রিকৃত ও আইন অমান্যকারীকে শাস্তির সুস্পষ্ট ঘোষণার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, গ্রামগুলোতে অনেক বিবাহই রেজিস্ট্রিকৃত হয় না এবং কাজী সাহেবগণও এ ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করে না।[৪] ফলে অনেক বিবাহই এখন পর্যন্ত সরকারের রেকর্ডভুক্ত হচ্ছে না। এতে এরূপ বিবাহের মাধ্যমে সৃষ্ট দাম্পত্য জীবনে কোন ভোগান্তি দেখা দিলে কেবল স্ত্রীকেই তার শিকার হতে হয়, যেহেতু আইনত তার করার কিছু থাকে না। আবার স্ত্রীর প্রাপ্য মাহরের টাকাও স্ত্রী পাচ্ছে না; যেহেতু বিবাহেরই কোন রেকর্ড নেই সুতরাং মাহর পরিশোধ করা হবে- এরূপ রেকর্ড থাকার প্রশ্নই আসে না। সুতরাং আইনগতভাবে স্ত্রী কেবলই বঞ্চিত হচ্ছে।

আইনটির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক এই যে, বহুবিবাহ হ্রাসের ক্ষেত্রে তা ভূমিকা পালন করে। একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ না করেও অবাধ বিবাহের ব্যাপারে কতগুলো শর্ত ও বাধা আরোপ করে এবং বিধি ভঙ্গের কারণে দণ্ডের বিধান করে এই আইনটি মুসলিম সমাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে (ধারা-৬) – যা কুরআনী শর্তের সাথে সামঞ্জস্যশীল (৪:৩)। এ আইনে তালাক কার্যকরী করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট এলাকার চেয়ারম্যানকে এবং স্ত্রীকে লিখিত নোটিশ প্রদান করতে হবে বলে বিধান করা হয়েছে। এটা স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ মেটানোর বিধিগত প্রচেষ্টা বটে। তবে আইনটির আরও উল্লেখযোগ্য দিক এই যে, তালাক-প্রদত্ত স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহের ক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তির সাথে বিবাহ এই আইনে রহিত করা হয়, যদি অনুরূপ বৈবাহিক সম্পর্কের অবসান তিনবার ঘটে না থাকে (ধারা-৭)। এতে প্রদত্ত হানাফী ফতোয়ার কার্যকারিতা রহিত হয়ে যায়, কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তা করে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, হাজ্জাজ ইবনে আরতাত, নখই ও ইবনে মুকাতিলের ফতোয়াকে সামনে রেখে আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।[৫]

ব্রিটিশ আমলে প্রণীত ১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইনটি ছিল হানাফী আইনের কঠিন নাগপাশ হতে নারী সমাজকে মুক্তি দানের প্রথম সোপান, কিন্তু মুসলিম পারিবারিক আইন ১৯৬১ সালে নারী সমাজের আরও বেশি মুক্তি নিশ্চিত করেছে। এই আইনে পুরুষ যেভাবে তালাক প্রদানে সক্ষম, তালাক তৌফিজ (অর্পিত ক্ষমতা) প্রাপ্ত স্ত্রীগণকেও তালাক প্রদানের সম-অধিকার দেয়া হয় (ধারা-৮)। এতে আরও উল্লেখ আছে যে, কাবিননামায় মাহর পরিশোধের কোন সুনির্দিষ্ট পন্থা উল্লেখ না থাকলে মাহরের সমগ্র অংকই স্ত্রীর তলব বা চাহিদামাত্র পরিশোধযোগ্য হবে (ধারা-১০)।

১৯৬১ সনের মুসলিম পারিবারিক আইনে নারীদের কেবলমাত্র অর্পিত ক্ষমতাবলে তালাক প্রদানের অধিকার দেয়া হয়। কিন্তু বাংলাদেশ প্রণীত ১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন আইনের মাধ্যমে উক্ত অধিকার সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত-সুনিশ্চিত করা হয়েছে এবং এতদুদ্দেশ্যে নারী-পুরুষ উভয় কর্তৃক বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের সহজীকৃত উপায় বিধিবদ্ধ হয়েছে (১৯৭৪ সালের ৭২ নং এক্ট : পরিশিষ্ট-৪)। বর্তমানে বাংলাদেশে মুসলিম বিবাহিতাদিগের আর আদালতের মাধ্যমে তালাক চাওয়ার আবশ্যকতা নেই। কাবিননামায় তালাকের অর্পিত ক্ষমতা প্রদত্ত থাকলেই একজন বিবাহিতা কাজীর নিকট গিয়ে তালাক রেজিস্ট্রি করতে পারেন। ১৯৮৫ সালের প্রণীত পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ প্রণয়নও বাংলাদেশ মুসলিম আইনের পারিবারিক বিষয়ে জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। উক্ত আইনের ৫ ধারা ও ২৩ ধারা মোতাবেক তালাক, দাম্পত্য জীবনের পুনরুদ্ধার, দেনমোহর, খোরপোশ, অভিভাবকত্ব এবং শিশুদিগের হেফাজত বিষয়ক মামলাগুলোর বিচারে পারিবারিক আদালত

একমাত্র ইখতিয়ারসম্পন্ন। মুসলিম বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন করণার্থে বাংলাদেশের জনসাধারণের ইতিপূর্বে যে বিভ্রান্তি ছিল এ মুসলিম বিবাহ তালাক রেজিস্ট্রেশন বিধি প্রণয়নে তা অবশ্যই তিরোহিত হয়েছে।

বাংলাদেশে মুসলিম আইনের ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে ধীর গতিতে সংস্কারমূলক পরিবর্তন-পরিবর্জন লক্ষ করা যাচ্ছে, যা ইসলামি শরীআর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা স্বরূপ এগিয়ে যাচ্ছে; যদিও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনে নানা অজুহাতে সমালোচনায় মুখর। তাদের সমালোচনার পিছনের যুক্তি যে, তারা পরিবর্তিত পরিস্থিতির আলোকে শরীআর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নতুন সমাধানের পথে না এসে তাকলীদের[৬] অন্ধ অনুসরণে ইতিহাসের কোন এক বিশেষ সময়ের সাথে এবং বিশেষ মাযহাবের সাথে নিজেদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছেন। ফলে তাদের কাছ থেকে নতুন সমাধান কিংবা সংস্কার পাওয়া দূরের কথা বরং যাঁরা এ ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন – তাদের অগ্রযাত্রায় এরাই হলেন প্রধান প্রতিবন্ধক। ইজতিহাদের[৭] সুযোগ তাদের অনেকেই স্বীকার করা সত্ত্বেও তারা এর সুযোগ থেকে নিজেদেরকে ও অন্যদেরকে বঞ্চিত রাখতে চেষ্টা করে; এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে যে নতুন ইজতিহাদ করার মতো যোগ্যতা সম্পন্ন মুজতাহিদের উপস্থিতি আর নেই। ফলে ইজতিহাদ করা যাবে না।[৮] তাদের এ সকল কথা-বার্তার প্রতি মুসলিম জনসাধারণ সাড়া দিতে পারছে না। কেননা আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানরা আজ নতুন সমস্যায় জর্জরিত যা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে হলে কিংবা যুগোপযুক্ত করতে হলে নতুনভাবে ইসলামিক সমাধান দরকার যা কেবল ইজতিহাদের মাধ্যমেই হতে পারে। সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে সমস্যার প্রকৃতি ও ধরনেরও রূপ পরিবর্তিত হয়ে থাকে। পরিবেশ ও পরিস্থিতির আলোকেও সমস্যা নানারূপে আবির্ভূত হতে পারে। এহেন পরিস্থিতিতে কোন এক বিশেষ ইমামের মাযহাব অনুসরণে সমাধান অসম্ভব। নিঃসন্দেহে পূর্ববর্তী সকল ইমাম আমাদের শ্রদ্ধাভাজন এবং আমাদের গর্বিত পূর্বসূরি। তারা নিজেদের সময় নিজেদের দেশে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে অক্লান্ত পরিশ্রমে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিভিন্ন ফতোয়া দিয়েছেন – যা আজ নতুন পরিস্থিতিতে নতুন ব্যাখ্যার দাবি রাখে। তাই কুরআন-হাদীসকে সামনে রেখে পূর্ববর্তী ইসলামি পণ্ডিতদের মতামতকে সাথে নিয়ে নতুন সমাধানে এগিয়ে আসাই হবে তাদের কাজ- যারা ইসলাম ও মুসলমান নিয়ে ভাবতে ভালবাসেন। আমাদের এ কথা জানা আছে যে, এক ইমাম একটি বিষয়কে যেখানে জায়েয বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন ঠিক তদ্রূপ বিষয়ে আর একজন ইমাম সেখানে সেটাকে না-জায়েয বলেছেন। যেমন – ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (রঃ) এর মতে স্বাধীন নারীর বিয়ে অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত জায়েয নয়; অপর দিকে ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর অনুসারী ইমামদের মতে স্বাধীন নারীর বিয়ে তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই জায়েয। এভাবে ফিকহ মাসয়ালার ক্ষেত্রে ইমামদের মতৈক্যের চেয়ে মতপার্থক্যই বেশি পরিলক্ষিত হয়। এর কারণ ছিল যে, একেকজনের চিন্তা-চেতনা একেক রকম ছিল। কাজেই একজন তার নিজ ভূমির জনসাধারণের সুবিধা-অসুবিধার কথা মাথায় রেখে যে ফতোয়া দিয়েছেন – তা আরেক জনের নিজ ভূমির জনসাধারণের পরিবেশ-পরিস্থিতির আলোকে ভিন্ন হতেই পারে। তাই তাদের ফতোয়াও ভিন্ন হয়েছে। অতএব একই বিষয়ের উপর ফতোয়া বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন পণ্ডিতদের কাছে ভিন্ন হয়েছে। এতে ইসলামি শরীয়ার মূলনীতির কোন ক্ষতি হয়নি; বরং এর আরও ব্যাপক বিস্তৃত ব্যাখ্যা হয়েছে।

সুতরাং ইসলাম প্রদত্ত ইজতিহাদের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ইসলামি পণ্ডিতদের উচিত বিশ্ব মুসলমানদের সমস্যা ও জটিলতার নতুন ইসলামি ব্যাখ্যা দান। এক্ষেত্রে স্মর্তব্য যে সাধারণ মুসলমানগণ ইসলামের অতি উত্তম ব্যবস্থাটি সর্বদা পালনে স্বতঃস্ফূর্ত নয়; অতএব তাদের সামনে কোন বিষয়ের মাসআলার সমাধান দেয়ার সময় ইসলামের অনুমোদনযোগ্য সীমানাটুকু বলে দেয়া দরকার যাতে তারা উক্ত সীমা অতিক্রম করতে অগ্রসর না হয়। একই বিষয়ের দু'টি দিক – একটি উত্তম আরেকটি জায়েয। উত্তম আর জায়েয কিন্তু এক জিনিস নয়। অল্প কিছু লোক উত্তম ব্যবস্থার উপর থাকতে পারলেও অধিকাংশ লোকের জায়েয বিষয়টিকে গ্রহণ ব্যতীত উপায় থাকে না। আল্লাহ পাক নিজেই পবিত্র কুরআনে এ দুটি ধারা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। যেমন – প্রতিশোধ নেয়া জায়েয হলেও ক্ষমা করাই উত্তম।[৯] পৃথিবীতে অধিকাংশ লোকই চায় প্রতিশোধ নিতে – তাই তাদেরকে এ সুযোগ ততটুকুই দেয়া

হয়েছে যতটুকু তার প্রাপ্য; কিন্তু তার চেয়ে বেশি নয় আর তা অবশ্যই হতে হবে আইন অনুযায়ী। আর যদি এ ব্যবস্থা না থাকত তাহলে জগতে আরও বেশি বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। অন্যদিকে খুবই কম সংখ্যক লোক পাওয়া যায়, যারা প্রতিশোধের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করাকেই বেশি পছন্দ করে। এভাবে একই বিষয়ের দুটি দিক যখন স্পষ্ট সেখানে মাসআলা প্রণয়ের ক্ষেত্রেও দুটি দিকের – উত্তম ও জায়েযের বিধি প্রণয়ন করা দরকার। কেবল উত্তমটি বলে দিয়েই দায়িত্ব শেষ হয়েছে বলে মনে করা যাবে না। বরং একই সাথে একই ব্যক্তিকে নিজস্ব আবেগ-প্রবণতার ঊর্ধ্বে উঠে বাস্তবতার আলোকে সাধারণ জনগণের সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ রেখে জায়েয দিকটিও অকপটে স্বীকার করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে নিজ কিংবা নিজের মাযহাবকে প্রাধান্য দিলে চলবে না; বরং জায়েয বিষয়টিকে অন্বেষণ করতে হলে অন্যদের মতামতকেও গুরুত্ব দিতে হবে। তবেই প্রকৃত সমস্যার সমাধান বের হয়ে আসবে। আর সাধারণ মুসলমান শরীয়ার আইনের প্রতি সচেতন হবে ও তা পালনে উদ্বুদ্ধ হবে।

এসকল দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে আমাদের ইসলামি পণ্ডিতদের উচিত চলমান মুসলিম পারিবারিক আইনকে আরও কিছু গতিশীল ও সহজ করার মতামত প্রদান করা। যেমন, নারীর তালাক প্রদান করার ক্ষমতা অর্পিত ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল যা নারীকে তার অধিকার প্রয়োগে কিছুটা অসুবিধায় ফেলেছে। রাসুলের সময় এরকম বহু ঘটনা দেখা যায়, যেখানে একজন নারী স্বামী কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতা ছাড়াই কেবলই রাসুলের কাছে এসে কিংবা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে স্বামীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারতেন।[১০] সেখানে তালাক দেওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল এবং নারীকে খোলা তালাকের মাধ্যমে এ পদ্ধতিতে আসতে হত। সবচেয়ে বড় কথা হলো স্বামীর ইচ্ছার উপর স্ত্রীর সে অধিকার প্রয়োগ নির্ভরশীল ছিল না; বরং তার অধিকার প্রয়োগে সে নিজেই ছিল স্বাধীন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) প্রদত্ত নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা আর স্বীয় মতামত প্রকাশের ক্ষমতা কি আজকে অচল? যদি অচল না হয়, তাহলে নারীকে কেনইবা মতামত প্রকাশের ক্ষমতা বা স্বাধীনতা প্রয়োগ স্বামীর উপর নির্ভরশীল করা হলো? সুতরাং আমাদের দেশে বিদ্যমান আইনটিকে আরও সংস্কার করে নারীর অধিকার প্রদানের ক্ষমতা নারীর উপরই ছেড়ে দিতে হবে।

১৯৬১ সালের পারিবারিক আইনের ১০ ধারা মোতাবেক মাহ্‌র[১১] প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে কাবিননামায় বিস্তারিত উল্লেখ না থাকলে স্ত্রীর তলব বা চাহিদামাত্র সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করতে স্বামী বাধ্য হবে। স্ত্রীর তালাক দেওয়ার ব্যাপারে স্বামীকে বাধা দান করার উদ্দেশ্যে মাহরের পরিমাণ প্রায়ই অধিক রাখা হয়। কারণ, তালাক দিলে স্বামীকে প্রতিশ্রুত যাবতীয় অর্থ প্রদান করতে হয় এবং প্রতিশ্রুত অর্থের পরিমাণ অনেক বেশি কিংবা স্বামীর পরিশোধের ক্ষমতার বাইরে, এ যুক্তিতে স্ত্রীর দাবির বিরুদ্ধে স্বামীর উপযুক্ত জবাব নয়।

স্ত্রীকে যাতে স্বামী তালাক দিতে না পারে সেজন্য স্বামীর সামর্থ্যের বাইরে অনেক বেশি মাহ্‌র ধার্য করা হয় – এটা আমাদের বর্তমান সমাজ-জীবনের সাধারণ চিত্র। এটা সামাজিক দৃষ্টিকোণে অনেকের কাছে কিছুটা যুক্তি সঙ্গত হলেও আসলে বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টই হয় যে, এর ফলে দুরবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। কেননা কোন দম্পতির মধ্যে যদি বনিবনা না হয় – তাহলে কোন শক্ত রশি দিয়ে বন্ধনের চেষ্টা করে বাইরের প্রলেপকে হয়ত কিছুটা ঠিক রাখা যেতে পারে কিন্তু ভিতরের অবস্থা দিন দিন আরও অবনতি হতে বাধ্য। তাই বাইরের দিককে প্রাধান্য দেয়ার পাশাপাশি ভিতরের দিককে উপেক্ষা করা উচিত নয়। তদুপরি শত চেষ্টা সত্ত্বেও দাম্পত্যের বন্ধনকে যদি আর টিকানো না যায় – তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের সহজ পদ্ধতি থাকা বাঞ্ছনীয়। একদিকে বিবাহ বিচ্ছেদের সময় স্ত্রীর প্রাপ্য মাহ্‌র আদায় করতে গিয়ে স্বামীর উপর যেন জুলুম করা না হয়, অন্যদিকে স্ত্রীকেও যেন শূন্য হাতে বিদায় না হতে হয়। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই এত উচ্চ হারে মাহ্‌র ধার্য করা হয়, যা আসলেই স্বামীর উপর জুলুমতুল্য। আর একজনের উপর জুলুম করে অন্য পক্ষের কোন ক্রমেই ফায়দা হতে পারে না। কেননা আল্লাহ পাকের বাণী : "তোমরা অত্যাচার করো না এবং অত্যাচারিতও হয়ো না"।[১২] এ আয়াত থেকেই স্পষ্ট হচ্ছে, অত্যাচারিত না হওয়ার প্রধান শর্তই হচ্ছে অত্যাচার না করা।

অতএব এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে বরের জন্য তা সাধ্যাতীত হয়। সামাজিক স্ট্যাটাস দেখাতে গিয়ে মাহ্‌রের পরিমাণ ইচ্ছাকৃতভাবে বেশি চাওয়া হয় ও বেশি দেওয়াও হয়; কনেকে স্বামী মাহ্‌র পরিশোধ করতে পারবে কি পারবে না তা যেন তাদের দৃষ্টিতে কোন বিষয় নয়। এক্ষেত্রে স্বামী ও কনের কোন ধরনের মতামতের তোয়াক্কা করা হয় না এবং শরীয়াতের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। কেবল মনগড়া সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে এরূপ মোটা অংকের মাহ্‌র ধার্য করা হয়। যা হোক এরূপ মোটা অংকের মাহ্‌র স্বামীও আদায় করেনা; স্ত্রীও পায়না। কেবলই বাসর রাতে মৌখিকভাবে মাফ চেয়ে নেওয়াকে চিরদিনের জন্য তা মাফ হয়ে যাওয়া মনে করে। তবে যদি কখনও আদালতের শরণাপন্ন হয়, তখন স্বামী পক্ষের চরম খেসারত দিতে হয়। আর মুষ্টিমেয় দু'একজন কনে কিংবা কনে পক্ষের লোকজন আদালতের আশ্রয় নিতে পারে – যাদের সাহস ও সাধ্য উভয়ই আছে। পক্ষান্তরে অধিকাংশের আদালতের আশ্রয় না নিতে পারায় কনে তার প্রাপ্য মাহ্‌রের ন্যূনতম অংশ হতেও বঞ্চিত হয়। এমনকি স্বামী কর্তৃক কিংবা স্বামী পক্ষ থেকে কনে ও কনে পক্ষের লোকজন হুমকি ধামকিরও সম্মুখীন হয়। সুতরাং এরূপ কাল্পনিক দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টিয়ে বাস্তবতার আলোকে চিন্তা করা দরকার। আবার কিছু সংখ্যক লোক পাওয়া যায়, যারা মনে করে যে, মাহ্‌র যাই ধার্য করা হোক না কেন, তা আদায় করতে হবে না; বরং স্ত্রীর কাছে মাফ চেয়ে নিলেই চলবে। এরূপ সংখ্যাই বেশি। যা হোক, এভাবে মাহ্‌র মাফ হয় না বরং এর মাধ্যমে স্ত্রীর সাথে প্রতারণা করা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে স্বামীকে তিনটি মারাত্মক বড় বড় গুনাহ করতে হয় – ১) ওয়াদা ভঙ্গ করা; যেহেতু স্ত্রীর সাথে ওয়াদা করা হয়েছিল যে, তাকে তার প্রাপ্য মাহ্‌র দেওয়া হবে – অথচ এখন দেওয়া হচ্ছে না। ২) স্ত্রীর অধিকার নষ্ট করা; পূর্বেই এ ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাহ্‌র না দেওয়ার অঙ্গিকার করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও স্বামীর উপর মাহর-ই-মিছল বা ন্যায্য মাহর দেয়া আবশ্যক। যেহেতু এটা আল্লাহ প্রদত্ত স্ত্রীর অধিকার, যা স্বামীকে আদায় করতেই হবে। ৩) প্রতারণা করা; বাসর রাত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই সাধারণত আবেগ-আপ্লুত থাকে, এমনই এক আবেগঘন মুহূর্তে চতুর স্বামী কর্তৃক ছলে-বলে-কৌশলে স্ত্রীর নিকট থেকে মাহ্‌র মাফ চেয়ে নেওয়া, বোধসম্পন্ন কোন মানুষ পছন্দ করতে পারে না। কেননা এটা চতুরতা ও প্রতারণা এবং নারীর সংরক্ষিত অধিকারের সাথে ছিনিমিনি খেলা। বরং এরূপ ক্ষেত্রে সমাধান হচ্ছে যে, স্ত্রী চাহিবা মাত্রই স্বামীকে তার প্রাপ্য পূর্ণভাবে পূরণ করতে হবে। কেননা স্বামী প্রতারক; তাকে আর সুযোগ দেয়া যায় না।

স্ত্রী কর্তৃক আংশিক মাহ্‌র মাপের বিধান হচ্ছে যে, স্বামীর কিছুটা আর্থিক কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্ত্রীর পূর্ণ প্রাপ্য আদায় করা নিজের উপর আবশ্যক মনে করে তা স্ত্রীকে সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তর করে এবং স্ত্রীর কাছে তার মাহ্‌রের পরিমাণ কিছু কমালে বা আংশিক মাফ করলে – তার জন্য কিছুটা ভাল হতো, এরূপ কিছু আকার-ইঙ্গিতে কিংবা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, নিজে ও অন্যকে দিয়ে প্রকাশ করানো; আবার স্ত্রী তার পূর্ণপ্রাপ্য হস্তগত হওয়ার পর স্বামীর প্রতি বড়ই খুশি– এবার স্ত্রী তার হস্তগত অর্থ কিংবা সম্পদ থেকে কিছুটা অংশ স্বতঃস্ফূর্ত মনে স্বামীকে ফিরিয়ে দিতে পারে। তবে এরূপ ছাড়ার ক্ষেত্রে এক তৃতীয়াংশের বেশি হতে পারে না। কেবল তখনই স্বামী জন্য স্ত্রীর ছেড়ে দেয়া ঐ অংশটুকু ভোগ করা জায়েয হবে, অন্যথায় নয়।

পবিত্র কুরআনে স্ত্রী কর্তৃক মাহ্‌র কিছুটা ছেড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বয়ং আল্লাহ পাক পাঁচটি শর্ত উল্লেখ করে বলেন : "আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে তাদের মাহ্‌র দিয়ে দাও খুশিমনে, তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করতে পার"।[১৩] এ আয়াতের আলোকে পাঁচটি শর্ত হচ্ছে–

(১) মাহ্‌র নগদ পরিশোধ হওয়া; কেননা আল্লাহ পাকের আদেশ 'আতুন্ নিসা'– তোমরা স্ত্রীদের মাহ্‌র পরিশোধ কর। আর এটা নগদই পরিশোধ করে স্ত্রীকে ঐ সম্পদ বা তার অর্থের মালিক বানিয়ে দিতে হবে। স্ত্রীর মাহ্‌র স্বামীকেই পরিশোধ করতে হবে, অন্যকে নয়। অন্যদিকে অভিভাবকগণকেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মাহ্‌র যার প্রাপ্য তার হাতেই অর্পণ করবে, তার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ যেন খরচ না করে।

(২) সম্পূর্ণ অংশই প্রদান করা; আল্লাহ পাকের বাণী– 'সাদুকাতিহিন্না' – তাদের (নারীদেরই) প্রাপ্য। এটা দ্বারা মূলত সম্পূর্ণ অংশ পরিশোধ করার কথা বলা হয়েছে। কেননা সম্পূর্ণ অংশের মালিক না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী কর্তৃক কিছুটা অংশ ছেড়ে দেয়ার আলোচনা হতে পারে না।

(৩) সন্তুষ্ট হৃদয়ে পরিশোধ করা; আল্লাহ্ পাকের বাণী 'নিহলাতান' – খুশি হয়ে বা আনন্দচিত্তে। স্ত্রীর প্রাপ্য পরিশোধ করার ক্ষেত্রে নানা রকম তিক্ততার সৃষ্টি হতে পারে। মাহ্র পরিশোধ করাকে মনে হতে পারে যেন জরিমানার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে। এ অনাচার রোধ করার লক্ষ্যেই আয়াতে 'নিহলাতান' শব্দটি ব্যবহার করে অত্যন্ত হৃষ্টমনে তা পরিশোধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অভিধানে 'নিহলাতান' বলা হয় সে দানকে যা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে প্রদান করা হয়। মোট কথা আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে যে, স্ত্রীদের মাহ্র অবশ্যই পরিশোধ্য একটি ঋণ বিশেষ। এটা পরিশোধ করা অত্যন্ত জরুরি, পরন্তু অন্যান্য ওয়াজিব ঋণ যেমন সন্তুষ্টচিত্তে পরিশোধ করা হয় স্ত্রীর মাহ্রের ঋণও তেমনি হৃষ্টচিত্তে ও উদার মনে পরিশোধ করা আবশ্যক।

(৪) স্ত্রীর খুশি মনে ছেড়ে দেয়া; আল্লাহ পাকের বাণী – 'ফা ত্বিবনা লাকুম' – তারা যদি তোমাদের প্রতি খুশি হয়ে ছেড়ে দেয়। এখানে স্ত্রীর মন থেকে, হৃদয় থেকে স্বামীর কার্যকলাপের প্রতি উদ্ভাসিত সন্তুষ্টির শর্ত লাগানো হয়েছে আর এটা তখনই হতে পারে যখন স্বামীর উপর স্ত্রীর জন্য অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা হয়। আয়াতে হৃষ্টচিত্তে প্রদানের শর্ত আরোপ করার পিছনে গভীর তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। কেননা মাহ্র স্ত্রীর অধিকার এবং নিজস্ব সম্পদ। হৃষ্টচিত্তে যদি সে তা কাউকে না দেয় বা দাবি ত্যাগ না করে তবে স্বামী বা অভিভাবকের পক্ষে সে সম্পদ কোন অবস্থাতেই হালাল হবে না। কেননা হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেছেন : সাবধান! জুলুম করো না। মনে রেখো, কারও পক্ষে অন্যের সম্পদ তার আন্তরিক সন্তুষ্টি ব্যতীত গ্রহণ করা হালাল হবে না।[১৫] মাহ্র আদায় সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার সময় অনেক স্বামী তার বিবাহিত স্ত্রীকে অসহায় মনে করে নানাভাবে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে মাহ্র মাফ করিয়ে নিত। এভাবে মাফ করে নিলে প্রকৃতপক্ষে তা মাফ হয় না। অথচ স্বামী মনে করত যে, মৌখিকভাবে যখন স্বীকার করে নিয়েছে, তখন মাহরের ঋণ মাফ হয়ে গেছে। এ ধরনের জুলুম প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যদি স্ত্রী নিজের পক্ষ থেকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মাহরের কোন অংশ ক্ষমা করে দেয়, তবেই তোমরা তা হৃষ্টমনে ভোগ করতে পার। অর্থাৎ চাপ প্রয়োগ কিংবা কোন প্রকার জোর-জবরদস্তি করে ক্ষমা করে নেয়ার অর্থ কোন অবস্থাতেই ক্ষমা নয়। বরং সেটাই হবে স্ত্রীর প্রতি এক প্রকারের নির্যাতন ও জুলুম করা। আর এমন জুলুমকারী স্বামীকে কেবল আখেরাতের শাস্তির কথা বলে ছেড়ে দেয়া যায় না; বরং নারী নির্যাতন আইনের অধীনে তার যথাযথ শাস্তি হওয়া উচিত।

(৫) অংশবিশেষ ছেড়ে দেয়া : আল্লাহ পাকের বাণী– 'শাইউম্ মিনহু'– উহার একটি অংশ। এখান 'হু' জমিরের মারযা হচ্ছে পূর্বোক্ত শব্দ 'সাদুকাতিহিন্না' অর্থাৎ তাদের প্রাপ্য অংশ। মাহর সম্পূর্ণরূপে হস্তগত হলেই অংশবিশেষের প্রশ্ন আসে। আর এই অংশটুকু সর্বোচ্চ কতটুকু হতে পারে, আয়াতে তা সুস্পষ্ট না হলেও ওসিয়ত করার সর্বোচ্চ পরিমাণের সাথে এটাকে ক্বিয়াস করে বলা যায় যে, তা কখনও এক তৃতীয়াংশের বেশি হতে পারে না। বরং এ পরিমাণের চেয়ে কম হওয়াই উচিত। কেননা ওসিয়ত করা হয় সাধারণত মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদের ব্যাপারে। সেখানে ওসিয়তকারী নিজের বৈষয়িক স্বার্থকে তুচ্ছ মনে করে। অপরদিকে এখানে স্ত্রীর সেই প্রান্তিক সময়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়নি, বরং তার নিজের দাম্পত্য জীবনের সূচনালগ্ন এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের সুবিধা-অসুবিধার প্রসঙ্গ বাদ দেয়া যায় না। কাজেই অসিয়তের সাথে তুলনা করে স্ত্রীর প্রাপ্য অংশ কোনক্রমে যদিও সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হলেও ওসিয়তকারীর অবস্থান ও স্ত্রীর অবস্থান একই সমান্তরালে পরিমাপযোগ্য নয়। অতএব স্বামী-স্ত্রীর কাছে স্ত্রীর প্রাপ্য মাহ্র পরিশোধ করা হতে নিজেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য মাফ চেয়ে নিতে পারে না। এটা স্ত্রীরই ব্যাপার – এক্ষেত্রে স্বামীপক্ষ হতে কোন রকমের কোন কিছুই ইসলাম মেনে নেয় না। যদি কোন স্বামী ঐরূপ কোন কিছু করেও থাকে – আইনের দৃষ্টিতে দোষী সাব্যস্ত হবে এবং মাহ্র পরিশোধ হতে নিজেকে বিরত রাখতে পারবে না।

বর্তমানে স্বামী ও স্বামীপক্ষ স্ত্রীর মাহ্র আদায় না করে বিপরীত দিকে কনের অভিভাবকের কাছে মোটা অংকের যৌতুক নিচ্ছে। একদিকে বিবাহযোগ্য কনেকে নিয়ে কনের অভিভাবক নিজেকে কিছুটা অসহায় ভাবে, আর এরই সুযোগ নিয়ে বর ও বরপক্ষ মোটা অংকের যৌতুক দাবি করে। বাধ্য হয়েই কনের অভিভাবককে এ অনৈতিক ও অযৌক্তিক দাবি মেনে নিতে হচ্ছে।

যদিও যৌতুক আদান-প্রদান আইনত নিষিদ্ধ, তবুও মুসলিম বিবাহ ক্ষেত্রে এটি একটি সাধারণ প্রথা। .... বর্তমানে প্রায় সব বিয়ের পূর্বেই বরের পক্ষ থেকে একটি যৌতুকের চাহিদাপত্র কন্যার পিতার কাছে পাঠানো হয়। এ ধরনের দাবি অনেক সময় কন্যার পিতাকে ঋণগ্রস্ত করে।[১৫]

ধর্মীয় বিধানে ও দেশের প্রচলিত আইনে যৌতুক প্রথা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম সমাজে তা যেন আজ আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে আছে। একদিকে যৌতুক প্রথার রমরমা উপস্থিতি অপরদিকে মাহরের প্রতি উপেক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের আর্থ-সামাজিক সমস্যাকে আরও বৃদ্ধি করেছে। স্বভাবতই যেখানে মাহরের প্রচলন থেকেও থাকে না সেখানে এরই স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে বিপরীত আরেকটি চিত্র – যৌতুক প্রথা। ফলে নারীর অসহায়ত্ব না কমে বরং বৃদ্ধিই পাচ্ছে। ফলে নারী একদিকে তার প্রাপ্য মাহরের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অন্যদিকে যৌতুকের নামে স্বামী কর্তৃক তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন-নিস্পেষণের শিকার হতে হচ্ছে; তার সাজানো সংসার ভেঙ্গে যাচ্ছে; এমনকি তাকে নির্দয়ভাবে জীবনও দিতে হচ্ছে।

এহেন দুরবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে, সর্বপ্রথম নারী জাতির অধিকার সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। আর এজন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক সংগঠনকেও ভূমিকা পালন করতে হবে। দেশের সকল ইলেক্ট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়াকে একযোগে একসাথে প্রচার প্রপাগান্ডা চালাতে হবে যাতে নারীর ধর্মীয় ও দেশের প্রচলিত আইনে স্বীকৃত অধিকারসমূহ সম্পর্কে মানুষের হৃদয়ে-মনে শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হয়। স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সিলেবাসে নারীর অধিকার সম্পর্কিত বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন, যাতে ছাত্রজীবন থেকেই নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায়। আবার মুসলিম পারিবারিক আইনকে বাস্তবতার আলোকে আরও সহজ ও স্পষ্ট হওয়া দরকার। যেমন, সেখানে মাহর ধার্যের কথা বলা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মাহর নগদ পরিশোধ হবে না বাকিতে, কিংবা তা ধার্যের পরিমাণগত দিক তথা মধ্যপন্থা বা সর্বনিম্নপন্থার পরিমাণ কতটুকু হতে পারে তা বলা হয়নি। স্মর্তব্য যে, হযরত ফাতিমা (রাঃ) কে হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক প্রদত্ত মাহরই মুসলিম জাতির কাছে মধ্যপন্থা মাহর হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে, যা বর্তমান বাজার মূল্যে প্রায় ৩৫,৫২০/= টাকার সমমূল্যে আসে।[১৬] আবার হানাফী ফকীহদের অভিমত অনুযায়ী, সেই সময়ের দশ দিরহাম আর বর্তমান বাজারমূল্যের (প্রায় ৭৪০ টাকা) সাথে তুলনা করে (যা বর্তমানে ২ তুলা সাড়ে ৭ মাশা রৌপ্য বা এর সমমূল্য) সর্বনিম্নপন্থা মাহরের পরিমাণ নির্ধারণ করা যেতে পারে। আর বাকিতে মাহর পরিশোধ করতে চাইলেও নগদ কিছু না কিছু দিতেই হবে। কেননা রাসূল (সাঃ) স্বয়ং আলী (রাঃ) কে এ মর্মে নসিহত করেছিলেন যে, তিনি (আলী) যেন ফাতেমা (রাঃ) কে কিছু নগদ দিয়ে তার (ফাতেমার) কাছে যান। আবার আরেক নিঃস্ব ও দরিদ্র সাহাবীকে বলেছিলেন এক জোড়া জুতা মাহর দিয়ে হলেও বিয়ে করতে পার। আর অবশিষ্ট মাহর বাকিতে দেয়ার নিয়ম হলো, স্ত্রীর কাছ থেকে যতদিনের সুযোগ নিয়ে পরিশোধ করতে চায় ততদিন উক্ত অর্থ ইসলামী অর্থলগ্নি কোন প্রতিষ্ঠানে জমা রাখলে মেয়াদ শেষে মুনাফাসহ যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যেত তা আদায় করা। এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ২০০০ ইং সালে মাহ্‌র একাউন্ট নামে একটি স্কীম চালু করে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ নিজ স্ত্রীর নামে উক্ত একাউন্টে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে পরিশোধের পরিকল্পনা করে সামর্থানুযায়ী মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারে। অন্যান্য ব্যাংক বা অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানও এরকম স্কীম চালু করে আগ্রহী পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

বিবাহের ক্ষেত্রে বর কনের শারীরিক যোগ্যতা নির্ণয়ের জন্যে বর্তমানে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে বরের জন্য ২১ বছর আর কনের জন্য ১৮ বছর উল্লেখ করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা যথাযথ ভাবে কার্যকর হচ্ছে না বার্থ রেজিস্ট্রার বাধ্যতামূলক না থাকায়। আবার এ ক্ষেত্রে কাজী ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আরো বেশি উদাসীন, তারা কোন ধরনের বাছ-বিচার না করেই রেজিস্ট্রার বইতে বর কনের জন্য সর্বনিম্ন বয়স লেখে আইনটিকে ফাঁকি দেয়। ফলে বাল্যবিবাহ আজো বন্ধ হয়নি। অতএব বার্থ রেজিস্ট্রার বাধ্যতামূলক করে আইনটি পালনে সবাইকে বাধ্য করতে হবে। উল্লেখ্য যে ইমাম আবু হানিফার প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার বয়স ছেলেদের ক্ষেত্রে ১৯ বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৮ বছর[১৭] যা আমাদের দেশীয় আইনের প্রায় সমর্থক। বিবাহের পূর্বে বর ও কনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

করেও শারীরিক উপযুক্ততা নির্ণয় করা যেতে পারে। আবার ইনকাম সার্টিফিকেটও চালু হওয়া উচিত, যাতে বরের অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে মাহরের পরিমাণ নির্ণয় করতে সহজ হয়। এভাবে বর্তমানে মুসলিম পারিবারিক আইনকে সময়-উপযোগী করে সাজাতে পারলে এবং তা পালনে কঠোরতা আরোপ করলে মানুষের মাঝে ফাঁকিবাজির প্রবণতা কমে যাবে ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হওয়া যাবে। পুরুষরা নারী-অধিকার প্রদানে আইনত আরো বেশি বাধ্য হবে।

মাহ্‌র আল্লাহ পাক প্রদত্ত স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার এবং তা আদায় করা স্বামীর উপর নামাজ-রোজার মতই ফরয। নারী-অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে সর্বাগ্রে তার মাহ্‌র আদায় করেই এর সূচনা করতে হবে। মাহরের যথার্থ অনুশীলনে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় হয় এবং যৌতুক প্রথার অবসান হয়। তাই এটা (মাহ্‌র) ধার্যের সময় স্বামীর সামর্থ্য ও স্ত্রীর মান-মর্যাদার প্রতি লক্ষ রেখে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে রাখতে এবং তা যথার্থভাবে আদায় করতে দেশে প্রচলিত আইন ও শরীয়া আইনকে আরো সংস্কারের মাধ্যমে সমন্বয় ও যুগোপযোগী করে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা উচিত।

তথ্যনির্দেশ :

১. মুজাদ্দিদ, আরবী কর্তাবাচক বিশেষ্য; ক্রিয়ামূল তাজদীদ অর্থ নবায়ন করা, সংস্কার করা। মুজাদ্দিদ অর্থ নবায়নকারী, সংস্কারক – এক কথায় যিনি যারা দীনকে সঠিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৭৮।

আবু হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে; রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক এই উম্মতের জন্য প্রতি শত বৎসরের মাথায় এমন ব্যক্তি উত্থান ঘটাবেন যিনি (যাঁরা) উম্মতের জন্য তাদের দীন নবায়ন করবেন।

আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহিম, হাদীস নং ৪২৯১, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৮০

২. আল কুরআন, ২ : ৩০

৩. আহমাদ, তিরমিযী সূত্র : বঙ্গানুবাদ খুৎবাতুল আহকাম, হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ); অনুবাদ মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুছ, এম.এম.; এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা; ১৩ এপ্রিল ১৯৭৯, পৃষ্ঠা ২।

৪. Population census 2001, B.B.S. (Bangladesh Beauro of Statistics; Planning Division, Ministry of planning, July 2003, p. 55

৫. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নভেম্বর, ১৯৮৩ পৃ. ৩৯৪।

তারা তাদের যুক্তির পক্ষে দলীল হিসেবে প্রধানত নিম্নোক্ত হাদীসটি পেশ করেন; আবা সাহবা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে বললেন : নবী করীম (সাঃ) ও হযরত আবুবকর (রাঃ) এর খিলাফত আমল পর্যন্ত একসঙ্গে দেয়া তিন তালাক এক গণ্য হত এবং উমর (রাঃ) এর সময় থেকে তা তিন তালাক গণ্য হতে শুরু হয়েছে, তা কি আপনি জানেন? জবাবে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন : হ্যাঁ। (মুসলিম; তাহাবী, মুসনাদে আহমদ, নাসাঈ)।

৬. যে ব্যক্তি বিচার বিবেচনা ব্যতিরেকে অপরের মত মেনে নেয় তাকে মুকাল্লিদ বলে। ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬২।

৭. ইজতিহাদ অর্থ – কোন কিছু হাসিলের উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গীণ চেষ্টা করা।

ইসলামী পরিভাষায় শরী'আতের কোন নির্দেশ সম্পর্কে সুষ্ঠু জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গীণ চেষ্টা ও সাধনার নাম ইজতিহাদ। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে কিয়াস (সাদৃশ্য ভিত্তিক সিদ্ধান্ত) প্রয়োগ করে ইজতিহাদ করা হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শরী'আতের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া মুজতাহিদের পক্ষে আবশ্যক নহে; বরং যে মাসআলা সম্পর্কে ইজতিহাদ করবেন সে সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬২-৬৩।

৮. সাধারণত মনে করা হয় যে, বর্তমান কালে ইজতিহাদের দ্বার রুদ্ধ, কারো পক্ষে এই যুগে ইজতিহাদ করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা একটি ভ্রান্ত ধারণা। ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৩।

৯. আল কুরআন, ১৬ : ১২৬।

১০. ২ : ২২৯ "তাহলে তাদের দু'জনের মাঝে এ সমঝোতা হওয়ায় কোন দোষ নেই যে, স্ত্রী স্বামীকে কিছু দিয়ে তালাক গ্রহণ করবে ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।"

১১. মাহ্‌র শব্দটি এক বচন, বহুবচনে মাহুর ও মাহরাতুন আসে; অর্থ বিবাহিক স্ত্রীকে আবশ্যিকভাবে দেয় অর্থ বা সম্পদ। আরবি ভাষায় নিম্নোক্ত শব্দগুলোও মাহর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে – ১) আস্‌ সিদাক; ২) আদ্‌ সদুকা; ৩) আল আকর; ৪) আল উজরা; ৫) আল আলাইক; ৬) আল হাবা। এতদ্ব্যতীত আল ফারিদা শব্দটি মাহর-এর নির্ধারিত অংকের অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কুরআন মাজিদে মাহর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে উজর শব্দটি – ৪ : ২৪, ২৫; ৫ : ৫; ৬০ : ১০; ৬৫ : ৬; সাদাকাতুন শব্দটি একটি স্থানে– ৪ : ৪। তবে মাহর শব্দটি উক্ত অর্থে বিশেষত ফিকহের কিতাবাদিতে সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৮ খণ্ড, পৃ. ৭৫২। উল্লেখ্য যে, মাহ্‌র যেহেতু স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্বামীর উপর ঋণ স্বরূপ সুতরাং এটাকে কোথাও কোথাও দেনমোহর বলা হয়।

১২. আল কুরআন, ২ : ২৭৯।

১৩. আল কুরআন, ৪ : ৪।

১৪. মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ২৫৫, সূত্র : মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহঃ) তাফসীরে মারেফুল কুরআন (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর), খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহ্‌দ, কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব, হি. ১৪১৩, পৃ. ২৩১।

১৫. বাংলা পিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১ম প্রকাশ, মার্চ ২০০৩, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১০৯।

১৬. 'মাসিক মদিনা' ডিসেম্বর ২০০৪ সংখ্যা, পৃ. ৪৭-এ দেখানো হয়েছে যে ১০ দিরহাম সমান ৩০০ টাকা। সে হিসেবে ৪৮০ দিরহামে আসে ১৪,৪০০ টাকার মতো। আবার আব্দুল খালেক-এর লেখা 'নারী ও সমাজ' বইয়ে দেখানো হয়েছে যে, ১২ আউকিয়া সমান প্রায় ৫০০ দিরহাম। বর্তমান হারে ১৩২ টাকার সমান।

উপরোক্ত দুটি মতে ২টি ভিন্ন হিসাব বের হয়েছে যেখানে অনেক ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। সেখানে বর্তমান বাজারে প্রচলিত দিরহামের সাথে তুলনা করে এ দুটি হিসাব বের করা হয়েছে – যা যৌক্তিকভাবে ও বাস্তবে ঠিক নয়। কেননা তৎকালীন সময়ে ১০ দিরহাম সমান ছিল ২ তোলা সাড়ে সাত মাশা রৌপ্য। আর স্বর্ণ ও রৌপ্যের হিসাব দিয়েই এর বর্তমান মূল্য বের করতে হবে। বর্তমানে ২ তোলা সাড়ে সাত মাশা রৌপ্যের মূল্য আসে ৭৪০ টাকা। আর এ ৭৪০ টাকার সমান হবে তৎকালীন প্রচলিত ১০ দিরহাম। এভাবে ৪৮০ দিরহাম সমান আসে ৩৫৫২০ টাকার মতো।

১৭. কুরতুবী, আল জামি লি আহকামিল কুরআন, বৈরুত ১৯৬৪ খ্রি. ৩য় খণ্ড, ৫ম পারা, পৃ. ৩৫-৩৬।

সূত্র : বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, সংকলক – মাওলানা মুহাম্মদ মুসা ও মাওলানা মুহাম্মদ মুজাম্মেল হক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, মার্চ- ২০০৪, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩২।